কাজলং-সাজেক প্রথম সফর ও অভিজ্ঞতা

আনন্দ প্রকাশ চাকমা

> মিইনি থেকে সাজেক পর্যন্ত বনজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যে বিবেচনাহীন নির্দয় অত্যাচার চলছে তা দেখে মন বিষাদে ভরে উঠে।

পনেরই মার্চ ২০০০। কাজলং, মিইনি ও সাজেক এলাকার সার্বিক অবস্থা সরেজমিনে দেখে আসার জন্য আমাদের নতুন পার্টি ইউপিডিএফ'র আহবায়ক প্রসিত বিকাশ খীসার নির্দেশে আমি উক্ত এলাকায় সফরে যাই। রুইখই মার্মা, প্রদীপন খীসাসহ সফর দলে আমরা বেশ ক'জন ছিলাম।

খাগড়াছড়ির শিবমন্দির এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে আমাদের যাত্রা শুরু। মিইনি, গঙ্গারাম, কাজলং নদী পেরিয়ে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা সাজেক এলাকায় পৌঁছি। মিইনি থেকে সাজেক পর্যন্ত বনজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যে বিবেচনাহীন নির্দয় অত্যাচার চলছে তা দেখে মন বিষাদে ভরে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গর্ব কাজলং রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় হাজার হাজার লোক জুম কেটে ঘন সবুজ এলাকাকে রং বদলিয়ে মরু ধূসর করে তুলেছে। মাত্র দু'চার বছর আগে যেখানে বড় বড় ঘন গাছের আড়ালে দিন-দুপুরেও সূর্য দেখা যেত না, এখন সেখানে খরা রোদে একটু জিরিয়ে নেওয়ার মত ছায়াদানকারী বৃক্ষটিও আর জীবিত নেই। পোড়া অর্ধপোড়া অবস্থায় বিশালাকারের অগণিত গাছ পাহাড়ময় নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। এই গাছগুলির প্রতিটির বয়স শত বছরের কম নয়। শুয়ে থাকা পোড়া অর্ধপোড়া গাছের পাশে তাদের গোড়াগুলি (মুড়া) বসে আছে নীরবে। যেন দিন-রাত এক মন এক ধ্যানে বসে বসে পাহারা দিচ্ছে যাতে ভূলুণ্ঠিত নির্জীব গাছটিকে কেউই চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে। আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকেও রেহাই দেয় নি। তাদের বাকলগুলিও পরিণত হয়েছে কালো অঙ্গারে। আমরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাই। বাকশক্তি থাকলে সেই নির্যাতিত বৃক্ষগুলো অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের নিকট করুণ না নালিশ জানাতো!

কাজলং-এর লালুতে গিয়ে দেখলাম সেখানে ছোটখাটো একটা বাজারও করা হয়েছে। রিজার্ভ ফরেস্টের গহীনে বাজার সৃষ্টি করাটা সত্যি অবাক করার মতো কাণ্ড বৈকি। তিন চার বছর আগে যেখানে বাঘের গর্জন আজ সেখানে হাট-বাজার। বাঁশ পাতার ছাউনি দিয়ে নির্মিত একটি ভিসিআর-এর হলও জমজমাট চলছে। সেখানে দেখানো হচ্ছে অর্ধ উলঙ্গ নায়ক নায়িকার হিন্দি বাংলা বিভিন্ন ছবি। পকেট ভরছে হল মালিকের। অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে যুব সমাজ। সেদিকে কারোর খেয়াল নেই। সবাই তাকিয়ে আছে রঙিন পর্দার দিকে।

স্থানীয় লোকজন লালু বাজারকে বাজার না বলে 'লালু শহর' বলে থাকে। এবং সেই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নেতা কার্বারী, কালা কুতু, সারথী বাপ, অতুলাল, স্নেহ কুমার, সুবত্তি বাপ, মামিনী সেনসহ গ্রামের (বাজার এলাকা) সকল ব্যক্তিবর্গের সাথে আমি কথা বলি। লালুর মত বন এলাকায় কিভাবে বাজার হলো, লোকজন কোথা থেকে এসেছে, রিজার্ভ ফরেস্ট উজার করে কেন জুম কাটা হচ্ছে - আমার এসব প্রশ্নের জবাবে তারা যা বললেন তা হচ্ছে:

"১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আমরা সবাই সাজেক এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করছিলাম। সেখানে শান্তিবাহিনীরা 'সেলেন্ডার' (সারেন্ডার) করার প্রাক্কালে সাজেক এলাকা থেকে আমাদেরকে গরু-ছাগলের মত তাড়িয়ে নিয়ে আসে। তারা (শান্তিবাহিনীরা) আমাদেরকে বলে যে, কাজলং রিজার্ভ ও সাজেক এলাকায় কেউ আর থাকতে পারবে না। সবাইকে আমাদের সাথে যেতে হবে। সরকারের সাথে আমাদের শান্তিচুক্তি হয়েছে। আর্মি এবং অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা এবার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চলে যাবে। সেটলারদের দ্বারা বেদখলকৃত সব জমিজমা ফেরৎ পাবো। DC, SP, OC,TNO, পুলিশ সব আমরাই হবো। প্রশাসনের সর্বস্তরে আমাদের আধিপত্য থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন আমাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। কাজলং রিজার্ভ ও সাজেক এলাকার শত শত পরিবারকে বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি ইত্যাদি প্রোপার এলাকায় পুনর্বাসন করাসহ নগদ বিশ ত্রিশ হাজার টাকা দেয়া হবে। বিভিন্ন চাকুরীতে প্রচুর লোক দরকার। তোমাদেরকেও ছোটখাটো চাকুরী করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

"তাদের কথা আমরা সরল মনে বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস না করলেওতো বিরোধিতা করার শক্তি ও সাহস দুটোই আমাদের নেই। আর কেই বা এই দুর্গম পাহাড় বুকে নিয়ে থাকতে চায়? নতুন জীবনের নতুন আশা নিয়ে শান্তি বাহিনীদের সাথে নিজের ভিটে মাটি ত্যাগ করে সাজেক এলাকা থেকে কাজলং-এ চলে আসি। তারা 'সেলেন্ডার' (সারেন্ডার) করতে বাঘাইছড়ি যায়। সেলেন্ডারের আনুষ্ঠানিকতা সেরে তারা নিজেরাই এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবার কথা। আমরা 'খাটি বস্তা' রেডি করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি। দিন যায়, সপ্তা যায়, পক্ষ যায়, মাস যায় কিন্তু তারা আর আমাদেরকে নিয়ে যেতে আসেনা। খবর পর্যন্ত দেয় না। অপেক্ষার পালা শেষ হলে পরিশেষে বুঝলাম তারা আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছে। আমরা প্রতারণার শিকার হয়েছি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, তাদের কি প্রয়োজন ছিল আমাদেরকে নিয়ে এসব তামাশা করার?

ঘর-বাড়ী ছাড়া নতুন সম্বলহীন যাযাবর অবস্থায় কত দিন আর থাকা যায়? উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত কাজলং রিজার্ভ এলাকাকে জুম চাষ ও বসবাসের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হই এবং তার সুবাদে এসব হচ্ছে।"

আমরা তাদেরকে কাজলং রিজার্ভ ফরেস্ট যে কোন প্রকারে সংরক্ষণের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বলি। কাজলং এর আরো উপরে কালুতে ছিলাতটেক নামে একটা জায়গায় নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে। তপন চাকমা নামে সেখানকার এক ব্যবসায়ী আমাদের সফরকারী টীমকে তার বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে মুনি কার্বারীসহ অনেকে শান্তি বাহিনীদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেন। তপন চাকমা আক্ষেপের সুরে বলেন, "শান্তি বাহিনীরা মনুষ্য জাতের নয়। এরা ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। তারা ২৫ বছর ধরে শুধু মানুষকে ঠকানোর কু-বিদ্যা শিখেছে। মানুষের ভালোর জন্য বিন্দু বিসর্গও শিখতে পারেনি। তারা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। আর জাতীয় স্বার্থকে দিয়েছে জলাঞ্জলী।" তিনি উত্তর পূর্ব দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আরো বলেন, "ঐ পাহাড়ে বিকিরণ বাবুর (শান্তিবাহিনীর সদস্য) মণ মণ আলা সংরক্ষণের বৃহদাকার গর্তগুলি এখনো বাংকারের মত রয়েছে। এক যুগেও ভরাট হবে না। আমাদেরকে বেগার খাটিয়েই এসব করা হয়েছে। শুধু বিকিরণ বাবু নয়। সিদ্ধার্থ বাবু, নবীন বাবু এবং অন্যান্য সব বাবুরাও এ রকম করেছে।"

ছিলাতটেকে এক রাত কাটানোর পর আমরা গিয়ে পৌঁছি সাজেক এলাকায়। গণ্ডা ছড়ায় গিয়ে দেখি একটা অর্ধ ভাঙ্গা বহু পুরনো মাটির ঘরে কালা বাধ্যা নামে এক লোক পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন। তার বাড়িটা একটা গ্রাম্য দোকানও বটে। ২ লিটারের মত তেল, ৫/৬ কেজি নুন, কয়েক কেজি 'সিদোল', কিছু ভারতের পাতা বিড়ি, খুব নিম্ন মানের কিছু বিস্কুট ও চকোলেট এই তার দোকানের মালামাল। জায়গাটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। কিন্তু বাংলাদেশী টাকা চলে

অবাধে গাছ কাটার ফলে সাজেক এলাকার পাহাড়গুলোর এ রকম চেহারা ধারণ করেছে

না। কারণ এলাকায় যে ক'জন লোক আছে তাদের সকলের জীবনযাত্রা মিজোরামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ৪০/৫০ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশের কোন বাজার নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই (সিদোল ছাড়া) তাদের ভারত থেকে নিয়ে আসতে হয়। তাই সাজেক এলাকার উভয় পাড়ের অধিবাসীদের প্রো ভারতীয়, প্রো বাংলাদেশী বলা যেতে পারে।

চারদিকে বহু বাড়িঘর চোখে পড়লো। কোনোটা পুরো ভাঙ্গা, কোনোটা অর্ধ ভাঙ্গা, আবার কোনোটা জরাজীর্ণ শত বর্ষীয় বৃদ্ধের মতো কোন রকম দাঁড়িয়ে আছে। সবই পরিত্যক্ত। লোকজন নেই। পুরো গণ্ডা ছড়া গ্রামে মাত্র তিন পরিবার তিনটা বাড়ীতে বসবাস করছে। বাকি রাশি রাশি জনশূন্য বাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের কোন এক রক্তপুরীতে গিয়ে পৌঁছেছি। এসবের রহস্য কি জিজ্ঞাসা করলে কালা বাধ্যা চাকমা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলতে লাগলেন:

"ভালমন্দ যা দেখছেন সবই ২৫ বছর সংগ্রামের ফসল। সারা জীবন শান্তিবাহিনীদের কথামত উঠতে বসতে পাছের রগ সম্পূর্ণ ঢিলা হয়ে গেছে। এখন নিজের ইচ্ছায় উঠাবসা করার জোরটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। তাদের নির্দেশে আমরা সাজেক এসেছি। এখানে বসতি গড়ে তুলেছি। এই গণ্ডা ছড়া গ্রামে একশ' পরিবারের মত লোক বসবাস করতাম। আমার এই বাড়ীর সামনে একটি বাজার ছিল। বাজারের উত্তর দিকে একটি জুনিয়র হাইস্কুল ও একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। কিন্তু আজ আপনারা নিজেরাই দেখুন কি অবস্থা। শান্তিচুক্তির সুফলের ভাগ দিতে বাবুরা (শান্তিবাহিনীরা) উন্নততর জীবন যাপনের কথা বলে এলাকার সবাইকে কাজলং-এর দিকে নিয়ে গেছে। এখন শান্তিচুক্তির ভাগ কে কি পরিমাণ পেয়েছে তা আমি জানি না। আমরা তিন পরিবার তাঁদেরকে ফাঁকি দিয়ে এখানে সুখে-দুঃখে রয়ে গেছি। এই যে অর্ধ ভাঙ্গা মাটির ঘরটা দেখছেন, তাও আমার নিজের নয়। এটা কালা কুতু চাকমা নামে এক জনের। সে বর্তমানে লালুতে। আমি তারই ত্যাগ করে যাওয়া ঘরটিতে বসবাস করছি। এই আর কি অবস্থা।"

তার মর্ম বেদনা ব্যক্ত করার পর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর দু'শ টাকার মধ্যে আমরা তার দোকানের সমস্ত বিস্কুট, চকোলেট ও বুট কিনে নিলাম। সেদিনের মত সেখানে রাতও যাপন করা হলো। পরের দিন খরা রৌদ্রে আমরা সাজেক পাড়ের গ্রাম বলপিয়ায় উপস্থিত হলাম। সেখানেও একই অবস্থা। প্রচুর ঘর-বাড়ী। কিন্তু লোকজন নেই। সমগ্র গ্রামে মাত্র পাঁচ সাতটিতে লোকজন রয়েছে। বাকীগুলো পরিত্যক্ত। যে ক'পরিবার লোক আছে তারা আমাদেরকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। তারা সবাই ডাকাডাকি করে একটা বাড়ীতে একত্রিত হয়ে আমাদেরকে তাদের সাধ্যমত আদর আপ্যায়ন করতে কোন ত্রুটি করেন নি। পানি, তামাকতো রয়েছেই। তারপর তারা খুব আদরে সহকারে কাপ গ্লাস ঘসে মেজে পরিষ্কার করে একেবারে গরম গরম যা পরিবেশন করলেন তা হচ্ছে লাল চা (রং চা)। হাঁটা চলার কঠোর পরিশ্রমের পর এক কাপ লাল চা শ্রান্তি দূর করতে সত্যিই খুবই সহায়ক।

চায়ের কাপ দেখে সঙ্গীরা সবাই হাসি খুশী। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে সবাই এক একটা হাতে নিলেন। দেখলাম যারা যারা পরিতৃপ্ত হওয়ার আশায় যেই মাত্র চায়ের কাপে চুমু দিয়েছেন তাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে এবং একে অপরের মুখ দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে মুচকি হাসছেন। অনেকে আড়ালে সুযোগ পেলেই কাপের চা মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন। আমিও তৎক্ষণাৎ কৌতূহলী হয়ে চায়ের কাপে চুমু দিতেই এতক্ষণ ধরে মুখ ফ্যাকাসে করা, পরস্পরকে হাসাহাসি ও আড়ালে চা ফেলে দেওয়ার রহস্য ভেদ করলাম। আমিও সামান্য না হেসে পারলাম না। আসলে চায়ের কাপে চিনির নাম গন্ধ নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে আপ্যায়নকারীরা জানালেন তারা চিনি ছাড়াই চা পান করেন। আর আমাদের চিনি না হলে চা চলে না। চিনি ছাড়া চা পান করা আমার জীবনে এটাই প্রথম এবং নতুন অভিজ্ঞতা।

এরপর আমরা যাই উদোল ছড়িতে। সেখানে এলাকার লোকজনতো বটেই মিজোরামের আন্ধারমানিক থেকেও চাকমা মুরুব্বীরা আমাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে ছুটে আসেন। তারা মিজোরাম থেকে একটা শুকর এনে আমাদেরকে নিমন্ত্রণও খাওয়ান। তাদের আন্তরিকতা আমাদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে। উদোল ছড়িতে আমরা সৌজন্যমূলক একটা মিটিংএর আয়োজনও করি। তাদেরকে ইউপিডিএফ-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। নতুন পার্টি সৃষ্টি হওয়ায় সকলেই আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে উদোল ছড়ি গ্রামের বর্ষীয়ান মুরুব্বী সাধন কার্বারী বলেন, "শান্তি বাহিনীরাতো আন্দোলনের বাজার থেকে তাদের দোকানপাট গুটিয়ে নিয়েছে। আমরা নিজস্ব একটা রাজনৈতিক দল ছাড়া অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারব না। পরিস্থিতির এ পর্যায়ে নতুন রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ গঠিত হওয়ায় আমরা অন্ধকারে আশার গঠিত পার্টিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তবে আপনাদের প্রতি (আমাদের উদ্দেশ্য করে) আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকবে এক একজন বাবুর জন্য যাতে প্রতি বছর এক একটা জুম করে দিতে না হয়।" সবাই তার কথার সমর্থনে 'ঠিক কথা ঠিক কথা' বলে সহাস্যে হাততালি দিয়ে ফেললেন। আমি কিছুই বুঝলাম না। বিষয়টি খোলাসা করে বলার অনুরোধ জানালে মধ্য [illegible]) বলেন, "শান্তি বাহিনীর প্রতিটি বাবুর জন্য প্রতি বছরই আমাদের এক একটা জুম করে দিতে হয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে। এই তিক্ততা অসহ্য। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে কার্বারী বাবু উক্ত শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। আমরাও তা সমর্থন করি।" তার কথা শেষ হতে না হতেই আর একজন বলে উঠলেন "এখান থেকে চিমুই মুক্তার বেশী দূরে নয়। সেখানে বিকিরণ বাবুর একটা দোকান ছিল। সেই দোকানে মালামাল আনা নেওয়ার কাজে কত বেগার খাটতে হয়েছে আমাদের। তাদের সব ধরনের বাড়াবাড়ি নীরবে হজম করা ছাড়া আমাদের আর কোন অধিকার ছিল না।"

শান্তি বাহিনীদের অন্যায় অবিচারের প্রতি তাদের যে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ছিল তা বুঝতে আর অসুবিধা থাকলো না। আমরা তাদেরকে শুধু এইটুকু বলে আশ্বস্ত করলাম যে, 'যা গত হয় তা আর ফিরে আসে না। শান্তি বাহিনী এখন শুধু অতীত। সে যুগের খেলা আর এ যুগে হতে পারে না। এখন সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই।'

আমরা সাজেক সফর এক প্রকার শেষ করে দুই দিন হেঁটে লালু বাজারে (স্থানীয়দের ভাষায় শহরে) ফিরে আসি। তিন দিন বিশ্রাম নিলাম। প্রৌঢ় বয়সের এক দম্পতি গোপনে এসে আমাদেরকে জানান যে, তারা একটা বহু মূল্যবান পিলারের সন্ধান জানেন। মাটির নীচের পিলারটি তোলার ইচ্ছা থাকলে তারা আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। পিলার যে খুব মূল্যবান তা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু সেটা আসলে কি জিনিস, দেখতেই বা কেমন তা তো জানিনা। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার, অজেয়কে জয় করার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। রহস্যময় ঐ জিনিসটি দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো। আমরা সেই দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলাম পিলারের স্থান দিউ জরুইয়ের কাছাকাছি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে। লালু শহর থেকে টানা আড়াই দিন হাঁটার পর আমরা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘন জঙ্গলময় এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আমাদের গাইড (ঐ দম্পতি) তর্জনী উঁচিয়ে খুব অদ্ভুত স্বরে বললেন, 'ঐ যে পিলারটি।' হাঁটু সমান উঁচু তিন কোনা বিশিষ্ট মাকরি সাইজের একটি স্তম্ভ চোখে পড়লো। আমরা সবাই শশব্যস্ত হয়ে স্তম্ভের কাছে ছুটে গেলাম। তৎক্ষণাৎ যা দেখা গেল তা কোনো মতেই সুখকর বা আশাব্যঞ্জক নয়। নির্ভেজাল সিমেন্ট, পাথরের টুকরো ও বালি সংমিশ্রণে নির্মিত তিন কোণা বিশিষ্ট একটি পাকা স্তম্ভ। তার গায়ে খাটি ইংরেজী বড় হাতের অক্ষরে একদিকে লেখা আছে INDIA আর একদিকে BANGLADESH এবং অপরদিকে একটি নম্বর (নম্বরটি নোট করা হয় নি)। তৎক্ষণে স্পষ্ট হলো যে, এটি সেই বহুমূল্যবান বহু কাঙ্ক্ষিত ইউরেনিয়ামযুক্ত কোনো পিলার নয়। এটি দুই দেশীয় বিরোধযুক্ত ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার। আড়াই দিনের ঘাম ঝরা পরিশ্রমের ফল যেন ঘামের সাথেই দূর হয়ে গেলো।

আমাদের গাইড দম্পতির আশার বাণী শেষ হয় না। তারা আমাদেরকে আরো একটা পিলারের কথা বললেন যেটা নাকি ভিন্ন রকমের। তাদের কথায় আমাদের কেন জানি আবার বিশ্বাস স্থাপন করতে ইচ্ছে হলো। সুতরাং দিউ জরুই থেকে আড়াই ঘন্টা ধরে হেঁটে পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দ্বিতীয় পিলারের স্থানে পৌঁছলাম। গাইড এবারও অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই সেই পিলারটি।' দেখা গেল কোমর সমান উঁচু একটি খাঁটি পাথরের চাপ্টা পাত নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গায়ে ইংরেজীতে কি যেন লেখা। খুব কষ্ট করে পড়া সম্ভব হলেও তার পুরো অর্থ কিন্তু দুর্বোধ্য। ইংরেজী হরফে লেখা মিজো ভাষা। তবে যেটুকু বুঝা গেল তা হচ্ছে 'জন্ম ১৮৪৩ সাল মৃত্যু ১৯২২ সাল।' অর্থাৎ এটি একটি লুসাইয়ের কবর যার জন্ম ১৮৪৩ সালে এবং মৃত্যু ১৯২২ সালে। সহসঙ্গী রুইখই মার্মা একটু রসিকতার সুরে বলে উঠলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা বুঝি চৌদ্দ পুরুষের কবর খুঁড়তে আসলাম। পরিশ্রমে, ঘামে চোখ-মুখ সব একাকার হয়ে উঠলেও হাসা কৌতুকে কি আর ঠোঁট বন্ধ করে রাখা যায়? আক্কেল সেলামী দিতে হলো, তাতে কি? তাই বলে কি হাসিরস বন্ধ থাকবে? সুতরাং রুই খই মার্মার কৌতুকে আমরা না হেসে পারলাম না।

বহু মূল্যবান পিলার প্রাপ্তির সাধ এবার পুরোপুরি মিটে গেল। সেই কবর স্থান থেকে আরো আড়াই দিন হেঁটে আমরা আবার লালু শহরে ফিরে আসি। সেখানে আরো কয়েক দিন বিশ্রাম নেয়ার পর দেড় মাস ব্যাপী কাজলং সাজেক এলাকা সফর শেষ করে এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ আমরা চট্টগ্রাম ফিরে এসে পার্টি প্রধানের কাছে সফরের রিপোর্ট পেশ করি।

এই সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় আমার নিজের ব্যক্তিগত কোন মন্তব্য বা মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করা হয়নি। শুধু যা প্রত্যক্ষ করেছি তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ■